১.৩.১ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা (Common People's Concept of Personality) :

সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝেন একজন মানুষের অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাকে। যে মানুষকে সবাই সমীহ করে চলেন, যার উপস্থিতিতে অন্য সকলেই কিছুটা ম্লান ও অনুজ্জ্বল, যার গুরুত্ব ও শক্তির স্বীকৃতি এই রকম মানুষের ব্যক্তিত্ব খুব বেশি বলে মনে হয় সাধারণ মানুষের চোখে। অপরদিকে যারা সকলের সঙ্গে, সর্বদাই সমঝোতা করে চলেন নিজের মতামত জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন না, সহজেই সব অনুসরণ করেন, সাধারণ মনুষের মতে তাদের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং ব্যক্তিত্বহীন এই দুই শ্রেণির প্রকৃতির মানুষের মাঝামাঝি যাদের অবস্থান তারা ক্ষেত্রবিশেষে তাদের চেয়ে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের কাছে ব্যক্তিত্ববান কিন্তু বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের উপস্থিতিতে তারা ব্যক্তিত্বহীন।

মনোবিজ্ঞানে কারও ব্যক্তিত্ব থাকা বা না থাকার প্রশ্নটি অবান্তর কিন্তু ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বিচারের যে কথা বলা হল তা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রথমে ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণাটি জানা দরকার।

১.৩.২ ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণা (Psychological Concept of Personality) :

প্রাচীন দিনে নাটকের কুশীলবরা নানাধরনের মুখোশ পরে অভিনয় করতেন। এই মুখোশগুলিই একটি চরিত্র থেকে আর একটি চরিত্রকে পৃথক করত। এই মুখোশগুলিকে বলা হত Persona আর তা থেকেই Personality শব্দটির উৎপত্তি। এর তাৎপর্য হল, মানুষের বাইরের যে রূপটি অর্থাৎ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে মেলামেশা করে আমরা একটা মানুষের রূপটা ধারণা করে নিই, সেটাই হল তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার অন্তর ও বাইরের প্রকৃতি কি আলাদা হয়, ঠিক যেমন মুখোশের আড়ালে থাকে আসল মুখটি, সেটি নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন একজন মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তার যে সত্যিকারের প্রকৃতি গড়ে ওঠে তাই হল তার ব্যক্তিত্ব। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বই অন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের চেয়ে স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞা দেওয়া হল।

ব্যক্তিত্বের প্রথম দিককার সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের ধারণার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মে (M.A.May) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিত্বের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

ব্যক্তিত্ব হল সেইগুণ যা ব্যক্তিকে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করায়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির সামাজিক উদ্দীপনার মান (Personality is that which makes one effective, or gives one over other. In the language of Psychology it is ones social stimulus value)।

পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বের অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা তার মধ্যে অলপোর্টের (G.W. Allport) দেওয়া ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সংজ্ঞাটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয় তার কারণ এই সংজ্ঞাটি ব্যক্তিত্বের গতিশীল স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করতে সক্ষম।

অলপোর্টের মতে— ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির মধ্যে যেসব শারীর মানসিক উপাদান তার পরিবেশের সঙ্গে অনন্য সামঞ্জস্য বিধানে নিয়োজিত তাদের একটি পরিবর্তনশীল সংগঠন (Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment)। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিত্বে উপাদানগুলির মধ্যে শারীরিক ও মানসিক দুই প্রকার উপাদানই বিদ্যমান। এই উপাদানগুলির যে সংগঠন তা গতিশীল বা পরিবর্তনশীল এবং সেই কারণেই। পরিবেশ

Scanned with CamScanner

ভিন্ন হলেও মানুষ তার ব্যক্তিত্বের নিরিখে প্রতিক্রিয়া করতে পারে যার উদ্দেশ্য হল পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সংগঠিতবিধান করা। সংগঠিতবিধান প্রক্রিয়াটি অনন্য কারণ, একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যজনের সংগঠিতবিধান ভিন্ন। সহজ কথায়, প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিত্বের দিক থেকে স্বতন্ত্র বা অনন্য, যদিও মূল উপাদানগুলি অভিন্ন।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ট্রাক্সলার (A. E. Traxler) ব্যক্তিত্বের পরিমাপযোগ্য একটি কার্যকর সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, ব্যক্তিত্ব হল সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক রূপ। আচরণ বলতে শুধু প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়। ঐ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত আন্তরিক অনুভব যা ব্যক্তি অন্তর্দর্শনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাও আছে (Personality will be defined as the sumtotal of an individual's behaviour in social situations. Behaviour includes not only overt acts but inward feeling tone produced by the situation as interpreted by the individual through introspeation)

বিগত পঞ্চাশ বছরে আরও যত সংজ্ঞা পাওয়া গেছে তার সারকথা উপরোক্ত সংজ্ঞাদুটির মধ্যেই নিহিত আছে।

৯.৪ ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব (Theories of Personality)

ব্যক্তিত্ব সম্ভবত মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রসঙ্গ। সেজন্য ব্যক্তিত্বকে জানার এবং ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। পারভিন (L. A. Pervin) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত তাঁর "ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব" (Theories of Personality) বইতে বলেছেন, ব্যক্তিত্ব এমন একটি মনোবৈজ্ঞানিক বিষয় যার সবটা একটিমাত্র তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেজন্য ব্যক্তিত্বের একাধিক সংজ্ঞা ও তত্ত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক।

ব্যক্তিত্ববিদরা ব্যক্তিত্বের তত্ত্বগুলিকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলি হল,—

(১) মনঃসমীক্ষণী মতবাদ (Psychodynamic Theory)
(২) সালক্ষণ তত্ত্ব (Trait Theory)
(৩) আচরণবাদী তত্ত্ব (Behaviouristic Theory)
(৪) মানবাদিক তত্ত্ব (Humanistic Theory)
(৫) অস্তিত্ববাদী তত্ত্ব (Existential Theory)
(৬) সামাজিক শিখন তত্ত্ব (Social Learning Theory)

এর মধ্যে মনঃসমীক্ষণী মতবাদ, সালক্ষণ তত্ত্ব এবং সামাজিক শিখন তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়ার পূর্বে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আর একধরনের চিন্তাধারা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ তার নিজের সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে অন্য মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব ব্যাখ্যা নিতে অভ্যস্ত। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা মানুষকে শ্রেণি বিভাগ করে নেওয়ার পক্ষপাতী। যেমন, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ ইত্যাদি। এই প্রবণতা প্রাচীনকাল থেকেই নানা দেশে নানা সময়ে লক্ষ করা যায়। প্রাচীন গ্রিসে হিপোক্রেটিস (Hippocrates) মানুষকে শারীরিক রসায়নের ভিত্তিতে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেন। যথা, উদ্যমী, কোপনস্বভাব, বিষণ্ণ এবং শ্লথ। ভারতীয় চিকিৎসায় (আয়ুর্বেদে) মানুষকে বায়ুপ্রধান, পিত্তপ্রধান, কফপ্রধান এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হত। ক্রেশমার (Kretschmer) শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে পেশিবহুল (Athletic)

Scanned with CamScanner

দীর্ঘকায় (Asthenic), হ্রস্বকায় (Pyknic) এবং অস্বাভাবিক (Dysplasitic) এই চারটি শ্রেণির কথা বলেন। পরবর্তীকালে শেলডনও (Sheldon) শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন।

মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করার প্রথম চেষ্টা করেন ইয়ুং (C.G. Jung)। তিনি বলেন অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ও তার স্থায়িত্ব বিচার করলে মানুষকে অন্তর্মুখী (Introvert) এবং বহির্মুখী (Extrovert পরবর্তীকালে Extravert) এই দুই শ্রেণিতে ভাগ হতে পারে। অধিকাংশ মানুষের অবস্থানই মাঝামাঝি বা তার কাছাকাছি। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্বে পরবর্তীকালে ইয়ুং এর শ্রেণিবিভাগকে একটি স্বতন্ত্র সংলক্ষণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

১.৫.১ ব্যক্তিত্বের মনঃসমীক্ষণী তত্ত্ব (Psychodynamic Theory of Personality) :

মনঃসমীক্ষণী তত্ত্বের জনক ভিয়েনার চিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)। তাঁর মতে আমাদের মনোজগতে যত ভাব, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি আছে, তা তিনটি শ্রেণিভুক্ত। এক ধরনের উপাদান আছে যে সম্বন্ধে আমরা সচেতন। অর্থাৎ আমরা জানি এগুলি আছে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, ইত্যাদি যা কিছু আমার 'আমি' ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আছে সেই সব মিলেই আমাদের সংজ্ঞান (conscious) মন। আর একধরনের উপাদান আছে, যা বিরাট এবং বিপুল, সেগুলি আছে আমাদের অজ্ঞাতে, সে সম্বন্ধে আমরা চেষ্টা করলেও সহজে সচেতন হতে পারি না, কিন্তু নানাভাবে তারা আমাদের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই উপাদানগুলি নিয়ে তৈরি হয়েছে নির্জ্ঞান মন (Unconscious mind)। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী একধরনের উপাদান আছে যা একসময় আমাদের গোচরে ছিল কিন্তু এখন অগোচরে। প্রয়োজন হলেই আবার তাদের সংজ্ঞান স্তরে আনা যাবে। যেমন, স্মৃতিতে সংরক্ষিত অভিজ্ঞতা। এদের বলা হচ্ছে আসংজ্ঞান (Pre-conscious)।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মন হল আদিম অন্ধ অসামাজিক কামনা বাসনার আধার। এই কামনাগুলি জীবন প্রবৃত্তি (Eros or Life Instinct) এবং মরণপ্রবৃত্তি (Thanatos or Death Instinct) প্রসূত। অসামাজিক যৌন কামনা (Sexual drives) ও আক্রোশ (Aggressive drives) প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নির্জ্ঞানস্তর থেকে সংজ্ঞান স্তরে উঠে আসার চেষ্টা করে কারণ এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে-কোনো উপায়ে কামনা চরিতার্থ করা। এরা সামাজিক রীতিনীতি, বাস্তব, সময় ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্ধ, শুধুমাত্র সুখভোগের নীতি দ্বারা (Pleasure Principle) পরিচালিত।

কিন্তু সত্যি সত্যি যদি আদিম কামনাগুলি সংজ্ঞান স্তরে উঠে আসে তবে তা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে বিপর্যয় ডেকে আনবে। সেজন্য অহং (Ego) নামক একটি সত্তা নির্জ্ঞানস্তরে এগুলিকে আবদ্ধ করে রাখে কারণ অহং বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার সূত্রে বাস্তব নীতি দ্বারা (Reality Principle) পরিচালিত। 'আমি' বলতে যা বোঝায় Ego হল তাই। কিন্তু তার ক্রিয়াতৎপরতা সংজ্ঞান থেকে নির্জ্ঞান স্তরে বিস্তৃত। সেখানে অহং-এর কাজকে বলা হয় সেনসর (Censor) যার অর্থ হল অসামাজিক কামনাগুলিকে নির্জ্ঞানে আবদ্ধ করে বাছাই করা কিছু নির্দোষ কামনাকে সংজ্ঞানে আসতে দেওয়া। এই আটকে রাখার কাজটাই হল অবদমন (Repression)।

নির্জ্ঞানস্তরে অহংকে নির্জ্ঞানের অধিরাজ আর একটি সত্তার সঙ্গে ক্রমাগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়। তার নাম অদস (Id)। অদসের কাজগুলি নির্জ্ঞান কামনার ধর্মপ্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। শুধু অদসের ভূমিকাটি এখানে বলা দরকার। অদসও অন্ধ সত্তা সুখভোগের নীতি দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু অদসের নিজস্ব সুখভোগ বলে কিছু নেই। সে শুধু নির্জ্ঞান কামনাগুলিকে শক্তিশালী করে পরিচালিত করে এবং তাদের চরিতার্থতার মধ্যে দিয়েই নিজে

চরিতার্থ হতে চায়। কিন্তু এর সবটাই ঘটে নির্জ্ঞানে, আমাদের অগোচরে। তা সত্ত্বেও এগুলিই আমাদের মানসিক শক্তির মূল উৎস।

নির্জ্ঞান মনের দাবি ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে গেয়ে অহংকে অনেক সময়ই কিছুটা সমঝোতা করে চলতে হয়। কখনও কখনও হয়ত কিছুটা অন্যায় কাজকেও প্রশ্রয় দিতে হয়। কারণ মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই এটা প্রয়োজন। সেজন্য অহংয়ের ওপর নজরদারি করার জন্য আর একটি সত্তা আছে যার নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন, অধিশাস্তা (Superego)। অধিশাস্তার দুটি অংশ। একটি হল আমাদের উচিত-অনুচিত বোধ (Ego ideal) আর অপরটি হল আমাদের ন্যায় অন্যায়ের সতর্ক প্রহরী বিবেক (Conscience)। বিবেকের কাজ শাস্তি দেওয়া। অর্থাৎ দৈবাৎ কোনো অন্যায় করলে আমরা যে অপরাধবোধে ভুগি তা বিবেকের দেওয়া শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু বাস্তব জীবনে সমঝোতা ছাড়া বাঁচা যায় না। অধিশাস্তা অস্বাভাবিক শক্তিশালী হলে, সব কিছুকেই উচিত অনুচিত এইভাবে বিচার করতে গেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা দুরূহ হয়ে ওঠে। সুতরাং অহং-এর আর একটি কাজ হল, অধিশাস্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করা। সুতরাং ফ্রয়েডের মতে আমাদের ব্যক্তিত্বের মূল কাঠামো অহং-এর এই তিন প্রকার সামঞ্জস্যবিধানের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে— এরা হল, অদস, বাস্তব এবং অধিশাস্তা। অহং যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তবে এই তিন শক্তির সঙ্গে সহজেই সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় এবং ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে। আর অহং দুর্বল হলে, হয় অদস নতুবা অধিশাস্তা অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ডেকে আনে।

নিজের শক্তিতে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব না হলে অহং কতগুলি কৌশল অবলম্বন করে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। এগুলিকে বলা হয় প্রতিরক্ষা কৌশল (Defence Mechanism)। প্রতিরক্ষা কৌশল অনেক প্রকার কিন্তু এর অধিকাংশই অহং প্রয়োগ করে নির্জ্ঞান স্তরে। ফলে সচেতনভাবে ব্যক্তির প্রায়শই এগুলির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কয়েকটি প্রতিরক্ষা কৌশল নীচে দেওয়া হল ঃ

অবদমন (Repression)— অসামাজিক কামনাকে নির্জ্ঞান স্তরে আবদ্ধ করে রাখা।

অস্বীকার (Denial)— জোর করে অসামাজিক কামনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা (আমার বাবার প্রতি কোনো আক্রোশ নেই)।

প্রতিক্ষেপণ (Projection)— নিজের অসামাজিক কামনা অন্যের ওপর আরোপ করা (বাবার আমার ওপর আক্রোশ আছে)।

প্রতিক্রিয়া গঠন (Reaction formation)— বিপরীত কামনা হিসেবে সংজ্ঞান স্তরে প্রকাশ করা (বাবার প্রতি আমার আক্রোশ নেই ভালোবাসা আছে)।

যুক্তিপ্রদান (Rationalisation)— অসামাজিক কামনাটিকে সামাজিক ও যুক্তিসংগত বলে প্রতিষ্ঠিত করা (বাবার প্রতি আমার রাগ আছে কারণ বাবা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন)।

উন্নয়ন (Sublimation)— অসামাজিক কামনাকে সৃজনশীল বা সমাজে প্রশংসিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করা (চিত্রকলা বা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যৌন কামনা চরিতার্থ করা)।

প্রতিসঞ্চালন (Transference)— এক ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সঞ্চালিত করে কামনা চরিতার্থ করা (কারুর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ ইচ্ছায়, নিরীহ প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা)।

Scanned with CamScanner

এই সব প্রতিরক্ষা কৌশলের সমন্বয়ে মানুষের মধ্যে নানা বিচিত্র ধরনের আচরণের সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড প্রতিরক্ষণ কৌশলের ভিত্তিতে শুধু মাত্র যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই নয়, তিনি মানসিক ব্যাধির প্রতিটি লক্ষণেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর সাহায্যে।

প্রশ্ন হল, কেন এক একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অহং ভিন্ন পরিমাণের শক্তি সংগ্রহ করতে পারে, অর্থাৎ কেন তারা প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করতে হয়? ফ্রয়েড তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার লিবিডো বিকাশের (Libido development) তত্ত্বের সাহায্যে। তাঁর মতে লিবিডো নামে একটি যৌনমানস (Psychosexual) শক্তি আছে যা আমাদের সহজাত। জন্মের পর থেকে যে সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই শক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় তার ওপর অহং-এর পরিণতি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়া কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। যেহেতু লিবিডো নামক যৌনমানসশক্তির উৎস নির্জ্ঞান মন, সেহেতু লিবিডোর পরিতৃপ্তি নির্ভর করে কোন্ কোন্ উৎস থেকে শিশু সুখভোগ করে তার ওপর।

প্রথম স্তরটিকে ফ্রয়েড বলেছেন, মৌখিক রতির স্তর (Oral erotic stage)। কারণ এই পর্যায়ে শিশু প্রথমে মুখের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের জন্য স্তন্যপানজনিত চোষণ প্রক্রিয়ায় প্রবল সুখ পায়। পরে তার মাড়ি শক্ত হয়ে দাঁত উঠলে তখন অপেক্ষাকৃত শক্ত জিনিস চিবিয়ে বা কামড়ে সুখ পায়। এই পর্যায়ে মৌখিক সুখ ব্যাহত হলে পরবর্তী স্তরের বেলায় শক্তির ঘাটতি থেকে যায়।

দ্বিতীয় স্তরটিকে বলা হয় পায়ুরতিস্তর (Anal erotic stage)। এই স্তরে সুখের উৎস মুখ ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত হয়। তখন শিশু মলমূত্র ত্যাগ করে আরাম পায়। আরও কিছু পরে সে চেষ্টা করে মলমূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার মধ্যে দিয়েই সে সুখভোগ করতে চায়। এই সময় তাদের সামাজিকবোধ জাগ্রত হতে শুরু করে এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের শিক্ষার (Toilet training) এই হল প্রকৃষ্ট সময়।

তৃতীয় স্তরে সুখভোগের উৎস আরও বিস্তৃত হয়। এই স্তরকে লিঙ্গাস্তর (Phallic stage) বলা হয় কারণ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার মধ্যে দিয়ে শিশুরা এই পর্যায়ে সুখভোগ করে। এইভাবে সুখের উৎস ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকায় শিশু একধরনের আত্মরতিতে (Self love) মগ্ন হয়ে পড়ে। এই আত্মকেন্দ্রিক স্তরের নাম দেওয়া হয় নার্সিসিস্টিক স্তর (Narcissistic stage)। আত্মকেন্দ্রিক সুখ চরিতার্থ করার জন্য শিশুকে এবার বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয় কারণ সুখের প্রকৃত উৎস হল বাইরের জগৎ। ক্ষুধার খাদ্য, মায়ের আদর, সবই আসে বাইরে থেকে। এই উপলব্ধি থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর শুরু হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে ইডিপাস স্তর (Oedipus stage)।

এই স্তরে প্রথম ভালোবাসার বস্তু হল মা। ফলে শিশু মাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে শিশুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তার বাবা। একদিকে বাবার প্রতি দ্বন্দ্বের অনুভূতি ও মার প্রতি ভালোবাসা আবার মা-বাবার পারস্পরিক ভালোবাসা—এই ত্রিকোণ সম্পর্ককে ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস গুঁড়িয়া (Oedipus Complex)। ইডিপাস গুঁড়িয়ার নিরসন কীভাবে হবে তার ওপর পরবর্তী ব্যক্তিত্ব গঠন অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিশু বাবার প্রতি তার নির্জ্ঞান দ্বেষ অবদমিত করে বাবার সঙ্গে একাত্মতা (Identification) অনুভব করে। বাবার আচরণ অনুকরণ করে বাবার মত হয়ে মাকে পেতে চায় এবং শেষপর্যন্ত সংজ্ঞান স্তরে বাবা মার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসায় তার পরিণতি হয়।

ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত পিতৃপ্রতিম যে সত্তা তাই শেষপর্যন্ত অধিশাস্তায় পরিণত হয়। আর

Scanned with CamScanner

লিবিডো বিকাশের সবস্তরগুলি যদি যথাযথভাবে অতিক্রম করতে পারে তা হলে শিশুর অহং উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কোনো স্তরে লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation) ঘটলে, অহং দুর্বল হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঠিকমত হয় না।

Scanned with CamScanner